ইক্যুইটিবিডি, তারিখ ২২ জুন ২০১৯ **খসড়া**

জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০ ও জলবায়ু অর্থায়ন: জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা ও সুরক্ষা অর্জনে সুনির্দিষ্ট, অগ্রাধিকার ভিত্তিক, প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে

১. জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০, আর্থিক প্রাক্কলনের রেকর্ড কিন্তু জনগনের আশা-আকাংখার প্রতিফলন কম

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং আমাদের মাননীয় নুতন অর্থমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দেশের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য প্রায় পাঁচ লাখ তেইশ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রতি বছরের মত এবারও বাজেট প্রনয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্থিক রেকর্ডের দাবী করছেন (অর্থমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলনে দেশের ইতিহাসে সর্বচ্চো রেকর্ডের দাবী করনে)। এখানে বিষয় হচ্ছে **জাতীয় বাজেটে রেকর্ড পরিমান আর্থিক প্রাক্কলন হবে এটা খুবই যুক্তিযুক্ত, কারন বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং দেশের জনসংখ্যা এবং এর বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদার বিবেচনায় প্রতি বছরই এর ক্রমবর্ধমান ও ধারাবাহিক আর্থিক উন্নয়ন হতে হবে এটিই কাম্য। এবং এটাও সত্য যে, তথাকথিত প্রবৃদ্ধিও এই ধারায় আগামী ২০৪১ সাল পর্যন্ত জাতীয় বাজেট যে ক্রমবর্ধমান হারে রেকর্ড স্পর্শ করবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে দারিদ্রতা দূরীকরন এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জাতীয় বাজেট জনগনের চাহিদা কতটা পূরন করেছে এবং তার দিক থেকে বাজেটের আর্থিক প্রাস্তাবনা আসলে কার্যকরভাবে রেকর্ড ছুয়েছে কিনা সেটাই হচ্ছে আসল বিবেচ্য বিষয়।** যদিও সরকার দাবী করছে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি হার বজায় রয়েছে এবং বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই দরিদ্রতার হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে স্বল্প আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হতে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রবৃদ্ধির সুফল তো দরিদ্র জনগনের কাছে যাচ্ছে না, বরং তা পুনরায় কিছু মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তির হতে কেন্দ্রীভূত হতে দেখছি এবং সম্পদ দেশের বাইর পাচাঁর হয়ে যেতে দেখছি। দেশের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের নিরিখে দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবন যাত্রার মান প্রত্যাশা অনুসারে বাড়ছে না যেটা আমরা এই প্রবৃদ্ধি সুফল থেকে আশা করেছিলাম। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের কৌশলগতভাবে যে আরও সাফল্য অর্জন করতে হব্যে তা আমাদের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। কারন আমাদের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন আমরা অন্তত: মানুষকে দুইবেলা আহার দিতে পেরেছি। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শুধুমাত্র আহার নিশ্চিত করা এই সরকারের দাবী হতে পারে না। **অর্থনৈতিক সু-শাসনের অভাবে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অসমতা ও মূল্য প্রতিযোগীতার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে দারিদ্রতার অভিঘাত আরও বাড়ছে। ফলে মানুষ দুবেলা খেতে পেলেও সেটাকে রেকর্ড পরিমান দারিদ্র দূরীকরন হয়েছে বলা হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে না।** যে কারনে ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংকসহ অনেক দাতা সংস্থা থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে দারিদ্রতার সংগা পুন:নির্ধারন করার, যাতে প্রকৃত দারিদ্রতা নিরূপন করা সহজ হয়। আমাদের সরকার এই পরামর্শ শুনলে আরও ভাল হয়। কারন ভারত ইতিমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আয় ও ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে দারিদ্রতার সংগা পুন:নির্ধারন করেছে, ফলে সেদেশে নতুন করে ১০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে যায় যাদের প্রকৃত কোন উন্নয়ন হয়নি। **আমাদের সরকার রেকর্ড পরিমান বাজেট দিলেও সেই বাজেট কাদের উন্নয়নে ব্যয় হবে এবং তাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি উন্নয়ন ও প্রকৃত জীবনমান স্বাচ্ছন্দ কতটা নিশ্চিত হবে তা সবসময়ই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কিন্তু উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।**

২. জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থপনার উন্নয়ন প্রশংসনীয়, তবে এর অগ্রগতি প্রকাশেরও উদ্যোগ নিতে হবে

এটা সত্য যে বিগত কয়েক দশক ধরে সরকার পরিবেশ উন্নয়ন বা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নয়ন বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। কিন্তু এই উন্নয়ন বিনিয়োগের পরিমান চিহ্নিত করা এবং তার ফলাফল পরিমাপ করার কোন কৌশল সরকারের কাছে ছিল না। তাছাড়া সরকার এবং দাতা সংস্থার কাছে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিনিয়োগের কোন স্বচ্ছ তথ্য না থাকায় উক্ত বিষয়ে বৈশ্বিক সহযোগীতা কৌশল নির্ধারনে সরকারকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। বিষয়সমুহ অনুধাবন করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার লক্ষ্য নিয়ে সরকার জাতীয় বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন, বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন বিয়ষক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করেছে যা নিসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং সরকারী অর্থব্যবস্থায় একটি মাইলফলক। যদিও এই ব্যবস্থাটি বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের উদ্যোগ এবং পারফরমেন্সকে পর্যবেক্ষন করার উদ্দেশ্যে দাতাদের সহযোগীতায় উন্নয়ন করা হয়েছে। সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন দিতে হবে বিশেষ করে বৈশ্বিক সহযোগীতা নিশ্চিত করার জন্য। তবে **আমার আশা করছি যে, জলবায়ু অর্থায়ন অগ্রগতি বাস্তবায়ন ফলাফলের উপর প্রতিবেদন জনগনের নিকট প্রকাশ করতে হবে, পাশাপাশি জলবায়ু বহির্ভূত অন্যান্য যে সকল উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে সরকার যে অর্থায়ন করছেন তার উপরও স্ব-প্রোনদিত বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন জনগনের কাছে প্রকাশ করবেন। এতে সরকার ও জনগন উভয়ই উপকৃত হবে।**

৩. প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রস্তাবনা

উল্লেখ্য যে সরকার গত তিন অর্থবছর ধরে "জলবায়ু অর্থায়ন" নামে জাতীয় বাজেট প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন করছে। চলতি অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার ২৫টি মন্ত্রণালয়কে জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং এই ২৫টি মন্ত্রণালয়কে জাতীয় বাজেট থেকে মোট ৩,০৪,০৩৮ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২৩,৭৪৮.৫৩ কোটি টাকা রয়েছে বলে সরকার জানিয়েছেন। **সরকারও আরও দাবী করেছেন যে প্রস্তাবিত জলবায়ু অর্থায়ন অন্তর্ভূক্তিকৃত ২৫টি মন্ত্রনালয়ের মোট বাজেটের ৭.৮১% এবং মোট জিডিপি'র ০.৮% এবং উন্নয়ন বাজেটে এই হার ক্রমান্বয়ে ক্রমবর্ধান।** সরকার দাবী করেছেন যে,

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার প্রধান পরিকল্পনা দলিল “বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯” এর বর্নিত ০৬ টি থিমেটিক এরিয়ার আলোকে (১. খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও সাস্থ্য, ২.সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৩. অবকাঠামো উন্নয়ন, ৪. গবেষনা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, ৫. কার্বন নিঃসরণ কমানো, ৬. সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা) এবারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে থিমেটিক এরিয়া-০১ খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সর্বচ্চো বরাদ্দ (৩৮.৮৯%) এবং থিমেটিক এরিয়া-০৩ অবকাঠামো উন্নয়ন দ্বীতিয় সর্বচ্চো বরাদ্দ (২৮.৬১%) পেয়েছে। এর বাইরে বাকি চারটি থিমেটিক এরিয়া বিশেষ করে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৮.৯৯%, প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট ১৪.৫৪%, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ৫.২০% এবং গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত জলবায়ু অর্থায়নের ৩.৭৭% পেয়েছে। **তবে এখানে বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ এবং বোঝার বিষয় যে, জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে ২৫টি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেট মাত্র ১৩,৮১৫ কোটি টাকা যা এই ২৫টি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের (৩,০৪,০৩৮.২২ কোটি টাকা) মাত্র ৪.৫৪% এবং মোট জাতীয় বাজেটের ক্ষেত্রে এই হার খুবই নগন্য (২.৬%)**।

৪. প্রস্তাবিত জলবায়ু অর্থায়নঃ শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়সমুহের অর্ন্তভূক্তি ছাড়া আর নতুন কিছু নাই

এখানে আমরা একথা বলছি এ কারনে যে, জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে ২৫টি মন্ত্রণালয়কে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এসকল মন্ত্রণালয়সমূহ জলবায়ু বিষয় নিয়ে জাতীয় আলোচনা ও উন্নয়ন কৌশল প্রনয়নের পূর্বেও ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই এসকল মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থান বিবচনায় বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসাবে পরিচিত এবং এসকল মন্ত্রণালয় ধারাবহিকভাবেই তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের ক্ষেত্রে কর্মসুচি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে এসকল মন্ত্রণালয়সমূহকে অর্ন্তভূক্ত করার ধারাবাহিক কৌশল গ্রহন করেছে শুধুমাত্র এবং বরাদ্দ রয়ে গেছে আগের মতই গতানুগতিক। কারন বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সৃষ্ঠ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে অনুসারে এসকল দুর্যোগ মোকবেলার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গতানুগতিক অর্থায়নের বাইরে অতিরিক্ত অর্থায়নের প্রয়োজন রয়েছে। অর্ন্তভূক্তিকৃত ২৫টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে সেরকম কোন অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় নাই। এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, **জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়াটি আসলে দাতাদের কাছে প্রতিশ্রুত কমপ্লায়েন্সের অংশ হিসাবে পরিপালন করা হচ্ছে এবং এই কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের শর্ত হিসাবে সরকার “জলবায়ু ফিসকাল ফ্রেমওয়ার্ক” উন্নয়ন করেছে এবং কোন প্রকার অতিরিক্ত অর্থায়ন ছাড়াই মন্ত্রণালয়সমুহকে যুক্ত করেছে এবং দাতা সংস্থা কতৃক নির্ধারিত কিছু ক্রাইটেরিয়ার মাধ্যমে গতানুগতিক বরাদ্দের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন সমুহ চিহ্নিত করেছে মাত্র। আমরা মনে করি সরকারকে শুধু জলবায়ু অর্থায়ন চিহ্নিত করলেই হবে না। বরং বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংকট বিবেচনায় নিয়ে অর্থনীতিকে টেকসই করার জন্য অবশ্যই ভবিষ্যতে জলবায়ু অর্থায়নের পরমিান অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় হারে বৃদ্ধি করতে হবে।**

৫. মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে

আমরা দেখতে পাচ্ছি ২০১৯-২০ চলতি অর্থবছরে মন্ত্রনালয় ভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন গত অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়কে ২১,৪৩০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের গড় বরাদ্দ ছিল ১০৭১.৫০ কোটি টাকা। কিন্তু চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্ন্তভূক্তিকৃত ২৫টি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ২৩,৭৪৮.৫১ কোটি টাকা যেখানে প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের গড় বরাদ্দ দাড়িয়েছে ৯৪৯.৯২ কোটি টাকা। অর্থাৎ **গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে গড়ে প্রতি মন্ত্রনালয়ের প্রায় ১২২ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান নিতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ক্রমহ্রসমান বাজেট বরাদ্দ কতটা যৌক্তিক তা অবশ্যই ভাবতে হবে। তাছাড়া সরকার যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় এবং বৈশ্বিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই তার পরিকল্পনা অনুসারে বরাদ্দ নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে।**

৬. ট্রাস্ট ফান্ডে এ বছর কোন বরাদ্দ নাই

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য বিশেষায়িত তহবিল হিসাবে “জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-বিসিসিটিএফ” গঠন করেছে এবং প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে একটা থোক বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু এ বছর বিসিসিটিএফ’র জন্য কোন বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয় নাই। বিগত বছরগুলোতে এই তহবিল থেকে ৫০০ এর উপরে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। যদিও এসকল বাস্তবায়ীত প্রকল্পসমুহের কার্যকারীতা প্রশ্নসাপেক্ষ তথাপি এটা বলা যায় যে, সঠিক ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় এই তহবিল জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলায় অবশ্যই কার্যকর অবদান রাখতে পারবে। দ্বীতিয়ত; **বিসিসিটিএফ পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের কাছে একটা উদাহারন। কারন বাংলাদেশই সর্বপ্রথম এ ধরনের বিশেষায়ীত জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের ধারনা সামনে নিয়ে আসে এবং বাস্তবায়ন উদাহারন সৃষ্টি করে। সুতরাং এর তথাকথিত ব্যর্থতা জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলায় বাংলাদেশের দক্ষতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।** আমরা মনে করি সরকারকে অবশ্যই বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করত হবে এবং বিসিসিটিএফ’কে কার্যকর করতে নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো সংশোধন করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে

এটা সত্য যে, ভৌগলিক কারনে বাংলাদেশের মানুষ প্রাকৃতিভাবে অধিক বিপদাপন্ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন এই বিপদাপন্নতার মাত্রাকে দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। **বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫% উপকূলে বসবাস করে এবং সরকারী হিসাব মতেই অতি বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ২০ মিলিয়ন যা ক্রমবর্ধমান।** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, খরা ও লবনাক্ততা এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এর আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতিও আমাদের কাছে দৃশ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশে ২৩৪টি বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানা সহ ও প্রায় ০২ লক্ষ প্রানহানীর ঘটনা ঘটেছে। **শুধমাত্র ২০০৭ সালে সংগঠিত ঘূর্ণিঝড় সিডড়ের কারনে তৎকালীন সময়ে তিন বিলিয়ন ডলার বা আমাদের জিডিপি’র ৫% সম্পদের ক্ষতি**

হয়েছিল, যা এখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার কারনে উপকূলে বেড়ীবাধসমুহের যে ক্ষতি হয়েছে তা আজ পর্যন্ত পুর্ননির্মান বা মেরামত করা সম্ভব হয় নাই। ক্রমাগত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে উপকূলীয় এলাকায় লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অত্র এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করার পাশাপাশি তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের ৭৫ শতাংশ বিলিন হয়ে যাওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। খরা মৌসুমে উজানের পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে লবন পানি প্রায় ২৪০ কিঃ মিঃ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে যার ফলে লবনাক্তত এলাকা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দুরবর্তী চরসমুহে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পূর্ন অরক্ষিত। সিইজিআইএস এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গত ১৫-২০ বছরে ৪০টিরও বেশি সংখ্যক নতুন চর জেগে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির হিসাব মতে এসকল চরের আয়তন প্রায় ১৬৪৫ বর্গ কিমিঃ এবং প্রায় পাচ লাখ লোকা বসবাস করছে এবং এই বসতি স্থাপনের হার বেড়েই চলছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এসকল দুরবর্তী চরসমুহে কিন্ত ধনী লোকেরা বাস করে না। দরিদ্র ভূমিহীন জনগগোষ্ঠীরাই একসল চরের অধিবাসী যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্পূর্নভাবে অরক্ষিত। কারন এসকল চরসমুহে এখন পর্যন্ত কোন প্রকার সুরক্ষা অবকাঠামো (বাঁধ ও সাইক্লোন সেল্টার) গড়ে উঠে নাই।

৮. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের প্রতিশ্রুতি ও অর্থায়নের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান

আমরা দেখতে পাচ্ছি য, বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনা শুরু হওয়ার পর থেকেই আমাদের সরকার উক্ত বিষয়টি নিয়ে দেশে এবং আন্তর্জাতিক ফেরামে বেশ সেচ্চার এবং অতি বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলারয় বৈশ্বিক সহযোগীতা দাবী করে আসছেন। পাশাপাশি সরকার তার নিজস্ব ক্ষমতায় কি করতে পারেন তা দেখানোর চেষ্টা করছেন যা প্রতিফলন হিসাবে আমরা সরকারের সকল পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে অগ্রাধিকার সমস্যা হিসাবে দেখেছেন এবং তা মেকাবেলা কার্যকর কৌশল গ্রহন করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। আমরা এর উদাহারন হিসাবে বলতে পারি সরকার তার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা “ভিশন-২০২১”, মধ্যমেয়াদী পরকিল্পনা (৭ম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) এবং জাতীয় বাজেটে সবখানেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসমুহ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এসকল সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হতে পারে এবং দারিদ্রতাও বাড়তে পারে। যে কারনে গতানুগতিক উন্নয়নের বাইরে অতিরিক্ত কর্মকৌশল প্রনয়ন করতে হবে এবং অতিরিক্ত অর্থায়নও নিশ্চিত করতে হবে। এই ভাবনা থেকে সরকার ২০০৯ সালে বিসিসিএসএপি প্রনয়ন করেছেন এবং গতানুগতিক অর্থায়নের বাইরে প্রতি বছর অতিরিক্ত ০৫ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ চাহিদা প্রনয়ন করছেন শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে উন্নয়ন গতি ঠিক রাখার জন্য। সরকারের বাইরে বিশ্বব্যাংকও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অতিরিক্ত অর্থায়নের চাহিদা বিশ্লেষণ করেছে এবং বলেছে যে ২০৫০ সাল নাগাদ প্রতি বছর ১৬৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। কিন্ত বাস্তবতা হচ্ছে সরকার প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা করছে, ২৫টি মন্ত্রনালয়কে অন্তর্ভূক্ত করলেও চলতি বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ বরাদ্দ নিশ্চিত করে নাই ।

৯. আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহে ঘাটতী বাধাগ্রস্থ করছে উন্নয়ন বিনিয়োগ

আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি বছর সরকার আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহের পরিমান বাড়াতে পারলেও তার ৮০-৯০% বরাদ্দ যাচ্ছে অনুন্নয়ন খাতে। আমাদের মাননীয় নুতন অর্থমন্ত্রী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশীয় সম্পদের বর্ধিত যোগান নিশ্চিত করার কথা বললেও বাস্তবে তা করতে পারবেন কিনা তা সময়ই বলে দিবে। কারন আভ্যন্তরীন সম্পদ আহরনে আমরা নতুন অর্থমন্ত্রীর কাছে গতানুগতিক কৌশলের বাইরে নতুন কিছু আশা করছিলাম বিশেষ করে প্রতক্ষ্য কর আদায়ে গুরুত্বারোপ, কিন্তু তিনি সে পথে হাটেন নাই বরং পুঁজিপতিদেরকে কর ছাড় ও ভর্তূকী দেওয়ার কৌশল গ্রহন করেছেন। এতে প্রবৃদ্ধি হয়ত বাড়তে পারে কিন্তু আভ্যন্তরীন সম্পদ আহরন লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী আদায় হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। চলতি ১৯-২০ অর্থবছরেও মোট রাজস্বের প্রায় ৯০% (৩,১১,৫০৭ কোটি টাকা) যাবে অনুন্নয়ন/পরিচালন ব্যয় খাতে। সেক্ষেত্রে সরকারের প্রস্তাবিত ২,১১,৬৮৩ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচিতে মাত্র ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকা যোগান দেওয়া সম্ভব হতে পারে রাজস্ব আদায় থেকে। অবশিষ্ট অর্থেও জন্য সরকারকে ঋন এবং দাতা সংস্থার উপর নির্ভর করতে হবে।

১০. প্রবৃদ্ধি নির্ভর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ; নিশ্চিত হচ্ছে না বিপদাপন্ন জনগনের অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা এবং সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাায় এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন উন্নয়নই টেকসই হবে না যদি জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব না হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কৌশলে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার উন্নয়নের খাত হচ্ছে অভিযোজন খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিতকরন, যেটা সরকার স্বীকার করে। কিন্তু সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা চলতি অর্থবছরের এডিপিতে যোগাযোগ এবং বিনিয়োগ অবকাঠামোর উন্নয়নসমুহ সরকারের অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং অভিযোজন খাতের অবকাঠামো বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষায় বাঁধ নির্মান ও উন্নতকরন, লবনাক্ততা দূরীকরন এবং সেচ ও সুপেয় পানি সরবরাহ ইত্যাদি খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব অনেক কম পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উন্নয়নের জন্য এসকল বিনিয়োগরে প্রয়োজন নাই, কিন্তু উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া অন্যান্য বিনিয়োগের ফলাফল হবে অনেকটাই অর্থহীন এবং ঝুকিপুর্ন। আন্তর্জাতিক হিসাব অনুসারে (জার্মান ওয়াচ ২০১৫) গত বিশ বছরে শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারনে বাংলাদেশ ২,২৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৩০-৪০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে বিপদাপন্নতার মধ্যে রয়েছে। এসকল বিপদের মধ্যে রয়েছে ঝড়-জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন, সুমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। তাছাড়া লবনাক্ততা বৃদ্ধির কারনে কৃষিকাজের সম্ভাবনা ক্রমেই নিশে:ষ হয়ে যাচ্ছে। যে কারনে টিকে থাকাটাই হচ্ছে জনগনের অগ্রাধিকার চাহিদা এবং টিকে থাকার উদ্দেশ্যে বিশাল জনগোষ্ঠীর শহরমূখী অভিবাসন প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সবাই মনে করেন। সুতরাং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অতিমাত্রায় অভিবাসন সরকারের অন্যান্য বিনিয়োগ সুফলের উপর চাপ প্রয়োগ করবে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

১১. উপকূলীয় এলাকার বর্তমান অবস্থা এবং অভিযোজন খাতের অগ্রধিকার চাহিদা

ক. বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর রক্ষায় বাঁধ মেরমাত ও উন্নয়ন হওয়া উচিৎ অগ্রাধিকার বিনিয়োগ খাত

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৬০'এর দশকে বেড়ীবাঁধসমুহ তৈরী হয়েছিল মূলত; সাগরের জোয়ার ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা কৃষি জমিসমুহ রক্ষা করা এবং কৃষি বিল্পব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে। যে কারনে বাঁধের উচ্চতা সাগরের সাধারন জোয়ারাধারকে মাথায় রেখেই ঠিক করা হয় এবং সে অনুসারে নির্মান করা হয়েছিল। তবে সময়ের বিবর্তনে বর্তমানে এসকল বাধেঁর অধিকাংশই বিগত ছয় দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঝড়-জলোচ্ছাসের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ এবং উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে। **সরকারের সংরক্ষিত তথ্যানুসারে সারাদেশে প্রায় ৭,৫৫৫ কিঃমিঃ বাঁধ রয়েছে। এর মধ্যে উপকূলীয় এলাকার বাধেঁর পরিমান প্রায় ৪,০০০ কিঃমিঃ। এসকল বাধঁ সময়মত ও পরিকল্পনা মাফিক মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন করা হচ্ছে না। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারন ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছাস এসকল বাধেঁর ক্ষয়ক্ষতি আরও বৃদ্ধি করছে। ফলে জনগনের জীবন-সম্পদের ঝুকিঁও বৃদ্ধি পাচচ্ছে।** বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে উপকূলীয় এলাকা বাংলাদেশের মোট ভূমির ৩২% এবং ২০৫০ সাল নাগাদ সেখানে জনসংখ্যা দাড়াতে পারে প্রায় ৬০ মিলিয়ন। জনসংখ্যার এই ক্রমবর্ধমান হার মানুষকে বাধ্য করছে অতিবিপদাপন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিবাসন এবং বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং সরকারের দায়ীত্ব রয়েছে এই বিশাল অভিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা মাফিক সমর্থন দেওয়া যাতে তাদের জীবনযাত্রা অধিকতর নিরাপদ হয়।

খ. পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অপ্রতুল বরাদ্দ; বাধঁ উন্নয়নের দায়ীত্ব বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র হাতে

মাননীয় মন্ত্রী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে অভিযোজন কর্মসুচির গুরুত্ব স্বীকার করনে কিন্তু বাধঁসমুহের উন্নয়নের জন্য উপকূলীয় এলাকায় প্রয়েজনীয় বরাদ্দ না দিয়ে তিনি তা বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। উপকূলীয় এলাকায় বাধঁ নির্মান, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য দায়ীত্বপ্রাপ্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ২০১৯-২০ চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,৩৭১ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের সকল এলাকায় (উপকূলীয় এবং অ-উপকূলীয় এলাকা) বাঁধ নির্মানের জন্য দায়ীত্ব প্রাপ্ত এবং সেক্ষেত্রে ২৩৭১ কোটি টাকা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। **বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র উপকূল এলাকায় প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মান, মেরামত ও সংরক্ষনের জন্য যদি পাঁচ বছর মেয়াদী পরকিল্পনা নেওয়া হয় তাহলেও সরকারকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১৫,০০০-১৬,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা উচিৎ। তারা মনে করেন বর্তমান অর্থনৈতিক পেক্ষাপটে এই পরিমান বিনিয়োগে সরকারের যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে এবং সরকারকে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন।** সরকার সেটা না করে দাতাদের পরামর্শ শুনছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে দাতারা অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি কিন্তু তাদের স্বার্থ (?) নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার অর্থায়ন করছে না। যে কারনে উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষায় সময়মমত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। **বর্তমানে বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র অর্থায়নে উপকূলীয় বাধঁ উন্নয়ন কর্মসুচী Coastal Embankment Improvement Program (Phase-01) নামে ২০২০ সাল পর্যন্ত পাচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জানামতে উক্ত প্রকল্পে উপকূলীয় এলাকায় ১৭টি পোল্ডারের বাধঁসমুহের মেরামত এবং উন্নয়ন করা হবে এবং অর্থায়নের পরিমান প্রায় ৩০০ মিঃ ডলার।** তবে প্রথম পর্যায়ের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের দ্বীতিয় পর্যায়ের সম্প্রসারন হতে পারে যেখানে অর্থায়নের পরিমান ০২ বিলিয়ন ডলারের মত। তবুও এই পরিমান কর্মসুচি উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদার তুলনায় খুবই নগন্য, কারন **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শুধুমাত্র পোল্ডারসমুহ নয় বরং সমস্ত বাধেঁর মেরামত এবং উন্নয়ন জরুরী এবং এটাই জনগনের অগ্রাধিকার চাহিদা বলে আমরা মনে করি।**

১২. ২০১৯-২০ প্রস্তাবিত বাজেট ও জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে আমাদের দাবী

ক. জলবায়ু পরিবর্তন কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য সরকারকে অতিরিক্ত বরাদ্দ ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

এটা এখন সার্বজনীন সত্য যে গতানুগতিক অর্থায়ন কৌশল জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে আমাদের বিপদাপন্নতার কথা বলে বৈশ্বিক সহযোগীতার দিকে চেয়ে বসে থাকলেও আমাদের চলবে বলে মনে হয় না। আমরা বৈশ্বিক সহযোগীতার আশায় জলবায়ু বিষয়ক "ফিসকাল ফ্রেমওয়ার্ক" প্রনয়ন করেছি এরকম ধ্যান ধারনা পোষন করলে উক্ত সমস্যা মোকাবেলায় যে অতিরিক্ত কর্মকৌশল ও অর্থায়ন প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য সুদুর পরাহত হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

দ্বীতিয়তঃ আমরা নিজেদের বাস্তব সমস্যা বিবেচনা করে এবং তা নিরসনকল্পেই জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা-২০০৯ প্রনয়ন করেছিলাম এবং সেখানে বলা হয়েছিল জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে রক্ষা পেতে হলে **উপকূলীয় এলাকায় অভিযোজন খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং উন্নয়ন বিনিয়োগ বিশেষ করে জলবায়ু অর্থায়ন-কেন্দ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০১০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত জিডিপি'র কমপক্ষে ১% পর্যন্ত অতিরিক্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।** হতাশাজনক হচ্ছে সরকার তার গতানুগতিক উন্নয়ন বিনিয়োগকে জলবায়ু অর্থায়নে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছেন যেটা কখনই জিডিপি'র ১% অতিরিক্ত বিনিয়োগ হিসাবে আসলে গন্য করা যায় না। সুতরাং সরকারকে অতিরিক্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং তা বর্তমান বিনিয়োগের বাইরে হতে হবে।

খ. জলবায়ু অর্থায়ন-কেন্দ্রিক উন্নয়ন বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার খাত নির্ধারন করতে হবে

সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে অবকাঠামো খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে নির্ধারন করেছেন। বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব বিশ্লেষনে এট সহজেই অনুমেয় যে, **সরকার প্রবৃদ্ধি-কেন্দ্রিক অবকাঠামোকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। আমরা এর বিরোধী নই তবে প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে না যদি অভিযোজন কেন্দ্রিক অবকাঠামোকে (বাঁধ, সাইক্লোন সেল্টার, উপকূলীয় বনায়ন ইত্যাদি) গুরুত্ব দেওয়া না হয়।** বিসিসিএসএপি ২০০৯'র প্রাক্কলন অনুসারে ৬,০০০ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ নির্মান প্রয়োজন যার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নেই, ২,০০০টি সাইক্লোন সেল্টার, ২০০টি বন্যায় আশ্রয় কেন্দ্র তৈরী এবং ৯,০০০ কিঃ মিঃ বনায়ন করার

সুপারিশ থাকলেও সে অনুসারে কোন বাজেট বরাদ্দ আমরা প্রস্তাবিত বাজেটে দেখছি না।

গ. কার্যকর জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে হবে

সরকার বৈশ্বিক অর্থায়নের আশায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP-National Adaptation Plan) প্রনয়ন কাজ হতে নিয়েছে। আমরা মনে করি এটা কোন দাতাদের পরামর্শের কারনেই করতে হবে এমন নয় বরং নিজেদের স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন কৌশল এবং সর্বপোরি উন্নয়নকে টেকসই করার জন্যই এই পরিকল্পনা প্রয়োজন রয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই আমাদের করনীয় সুনিদৃষ্ট ও কার্যকর হবে। **তবে এই অভিযোজন পরিকল্পনা অবশ্যই হতে হবে জনঅংশগ্রহন নিশ্চিত করা এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতেই, কোন তথকাথিত বিশেষজ্ঞের চাপিয়ে দেওয়া মতামতের ভিত্তিতে নয়।**

গ. সরকারকে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে এবং অর্থায়ন করতে হবে

এটা বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত যে বাংলাদেশ হচ্ছে দূর্যোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ন দেশ। লাখ লাখ মানুষ প্রতি বছর দুর্যোগের কারনে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে জীবন-জীবিকার তাগিদে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে অভিবাসিত হতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া একথাও স্বীকার করতে হবে যে, দুর্যোগ পুর্বেও ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে। কিন্তু এসকল দুর্যোগের ব্যাপকতা, পূনর্পৌনিকতা এবং তীব্রতা যেভাবে বেড়েছে তা অবশ্যই দীর্ঘসময়েরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বেড়েছে। উদাহারন সরূপ বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত হিসাবে যদি **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে ভষ্যিতে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৪০-৪৫ মিলিয়ন লোক বাস্তুচুত্য হওয়ার আশংকা রয়েছে। এই বিশাল বাস্তুচ্যুত্য জনগোষ্ঠী দেশের ভূমি ও অর্থনীতির উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে এসকল বাস্তুচ্যুত্য জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা সচল রাখার ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর সামর্থ্যের অভাবে দারিদ্রতা আরও প্রকট আকার ধারন করতে পারে।** সুতরাং ভবিষ্যতে সরকারকে বাস্তুচ্যুতি জনগোষ্ঠীর কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা অবশ্যই প্রনয়ণ করতে হবে এবং সে অনুসাওে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. জলবায়ু অর্থায়ন হতে হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদীহতির ভিত্তিতে

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় জনগনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০০৯ সালে জলবায়ু পরবির্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে এবং এ পর্যন্ত মোট ৩,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার পাশাপাশি প্রায় ৫০০ এর অধিক উন্নয়ন প্রকল্প সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এনজিওসমুহের মাধ্যামে বাস্তবায়ন করে। কিন্তু বাস্তবায়নকৃত এসকল প্রকল্পের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা আসলে কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা এখ পর্যন্ত প্রশ্নই রয়ে গেছে। এখনও ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের অযাচিত প্রভাব খাটানো এবং জলবায়ু প্রকল্প দেখিয়ে অন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থিক অনিয়মের খবর পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। **আমরা মনে করি সরকারের ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থায়নের প্রক্রিয়াকে একটি সু-শাসনের মধ্যে আনতে হবে এবং তা করা সম্ভব শুধুমাত্র এর ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডাদের অন্তভূক্তিকরনের মধ্য দিয়ে। এছাড়া ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড় এবং বাস্তবায়ন বিষয়ক তথ্য জনগনের কাছে প্রকাশ করতে হবে** এবং বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জন সম্পৃক্ততার নীতি গ্রহন করতে হবে।

চ. স্থানীয় জনগন ও জনপ্রতিনিধিদেরকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে

সরকার বাজেট বরাদ্দ দিচ্ছেন এবং এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে স্থানীয়ভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে। এসকল **উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে পরিকল্পানা, মধ্যবর্তী অগ্রগতি পর্যবেক্ষন, মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়া উপকারভোগী স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহন নাই বললেই চলে এবং সরকার এ জন্য কোন নীতিগত প্রক্রিয়াও অনুশীলন করছেন বলে মনে হয় না। সরকারকে অবশ্যই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।** আমাদের জনপ্রতিনিধিগন শুধু সরকারের কাছে বাজেট বরাদ্দ দাবী করেন কিন্ত এর উন্নয়ন অগ্রগতি এবং কার্যকারীতা নিয়ে জনগনের কাছে জবাবদিহী করতে তাদের খুব একটা দেখা যায় নাা। স্থানীয় জনগনের সাথে জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে পারলে তা জনপ্রতিনিধিদের সম্মান এবং সরকারের জনপ্রিয়তা ও গ্রহনযেগ্যতা দুটোই বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা মনে করি। সরকারকে বিষয়টি গুরুত্বে সাথে দেখতে হবে, **সকল জনপ্রতিনিধিগনকে তাদের এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যুক্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান/কর্মকর্তা, ঠিকাদার এবং নাগরিক সমাজকে সাথে নিয়ে প্রতি তিন মাস পর পর "উন্নয়ন শুনানী বা Public Hearing"করতে হবে**। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর সংসদে নিদৃষ্ট সময় অন্তর আলোচনা করতে হবে এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে সেখানে জবাবদিহি করতে হবে।

ছ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা একটি জরুরী বিষয়

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, দাতা সংস্থা সবাই বলে যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব বা ঘাটতী রয়েছে। আমরা সে বিষয়ে যাচ্ছি না। আমাদের অধিপরামর্শ বা প্রচারনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উপকূলীয় এলাকার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন প্রথম স্তরের সুরক্ষা (First Line Protection) কৌশল বিশেষ করে বাঁধ নির্মান এবং এর রক্ষনাবেক্ষন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। **আমারা পানি উন্নয়ন বোর্ডকে এক্ষেত্রে প্রথম স্টেকহোল্ডার বলে মনে করি এবং এটাও মনে করছি যে সেই ব্রিটিশ আমলের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা (আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী) অনুশীলন করে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুতারং পানি উন্নয়ন বোর্ডকে তার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে এবং উন্নয়ন পরকল্পনা (বাঁধ নির্মান ও ব্যবস্থাপনায়) জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন ও বাসতবায়ন তক্ষতা বাড়াতে হবে**। সরকারকেও এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে তার নীতিগত পরিবর্তন আনতে হবে।

সচিবালয়ঃ কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি (১ম তলা), সড়ক-০২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭।
ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫, ইমেইল: info@coastbd.net ওয়েবে: www.coastbd.net